Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 55–65
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

অপরাধতত্ত্বের আলোকে শরদিন্দুর দুর্গরহস্য

ড. ত্রিতীর্থ দাস
ই-মেইল: dastritirtha@gmail.com

Keyword
অপরাধ, সমাজ ও রাষ্ট্র, পেশাদার অপরাধী, গোয়েন্দা, সন্দেহভাজন, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে, ব্যোমকেশ বক্সী

Abstract

Discussion

অপরাধতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উঠে আসে অপরাধ কী প্রসঙ্গ। অপরাধ হল সমাজ স্বীকৃত আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেআইনি কাজ করা। অপরাধী হল সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুশাসন ভঙ্গকারী। আর অপরাধতত্ত্ব হল একটি বিচার সহায়ক বিজ্ঞান, যার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তদন্তকারীরা অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য যাচাই করে এবং অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যগুলোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শনাক্ত করে। অপরাধ সংঘটনের পেছনে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও অপরাধতাত্ত্বিকরা মনে করেন সমাজে অপরাধীরা দুই ধরনের মানসিকতার হয়ে থাকে। যথা—

ক) আবেগপ্রবণ অপরাধী
খ) পেশাদার অপরাধী

ক) আবেগপ্রবণ অপরাধীরা সমাজের বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে অপরাধ করে। এই সকল অপরাধীরা বেশিরভাগ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত রিপুরই শিকার হয়। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে পড়ে স্নায়ুর চাপকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অভাবের তাড়না, লোভ, ক্রোধ, যৌনঈর্ষা, প্রেমে প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি কারণে অনিয়ন্ত্রিত রিপুর বশবর্তী হয়েই এরা অপরাধ করে ফেলে। যেহেতু এরা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে, তাই এদের হৃদয় দুর্বল হয়; সেই কারণেই এরা যখন কোনও অপরাধ সংঘটন করে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধ সংঘটনস্থলে এমন কিছু ক্লু (clue) ফেলে আসে যে, তদন্তকারীরা সেই ক্লু'র ভিত্তিতেই অপরাধীকে শনাক্ত করে থাকে।

খ) পেশাদার অপরাধীরা অপরাধ সংঘটনের দ্বারা নিজেদের অপরাধ জগতে প্রতিষ্ঠা করবার পথকে প্রশস্ত করে থাকে। এই জাতীয় অপরাধীরা অপরাধ সংঘটনকেই পেশা হিসেবে গণ্য করে। এদের মানসিক প্রবৃত্তি এতটাই নৃশংস যে, এরা যে কোনও অপরাধকর্মে লিপ্ত হবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। এদের অপরাধ সংঘটনের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় পেশাদার অপরাধীরা প্রশিক্ষিত এবং স্থির চিত্তের অধিকারী। এই জাতীয় অপরাধীরা প্রত্যেকেই

উচ্চমেধাসম্পন্ন এবং অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে নিখুঁত পরিকল্পনার অনুসারী। তাই পেশাদার অপরাধীদের শনাক্ত করতে তদন্তকারীদের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও গভীর পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন; সঙ্গে অবশ্যই দরকার কৌশলী পদক্ষেপ।

সমাজে অপরাধীদের শনাক্ত করতে তদন্তকারীরা বা গোয়েন্দারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত গোয়েন্দা বা তদন্তকারী বিভাগ অপরাধীদের শনাক্ত করতে উদ্যোগ নেয়। ভারতবর্ষে যেমন রয়েছে সি.আই.ডি, সি.বি.আই, এস.টি.এফ, ই.ডি, এন.আই.এ; তেমনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এফ.বি.আই., ইন্টারপোল এজেন্সি প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধীদের শনাক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকটি দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি একইরকম তদন্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপরাধীদের শনাক্ত করে। অপরাধী শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইনভেস্টিগেশন (Investigation)। অপরাধ বিজ্ঞানী Caldwell ইনভেস্টিগেশন কীভাবে সম্পন্ন হয়,তার একটা দিককে দেখিয়েছেন—

> *"The major phase of criminal investigation are- 1) Gathering and preservation of evidence. 2) Identification of offenders. 3) Apprehension of offenders. 4) Recovery of stolen property when such property in involved, and 5) Presentation of evidence."* [১]

অমিতাভ ব্যানার্জি তাঁর '*Investigation of Crime*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন অপরাধ সংঘটনের ভিত্তিতে কীভাবে তদন্তকারী সংস্থা ইনভেস্টিগেশনকে পরিচালনা করে—

> *"Investigation consists of diverse step viz:*
> *a) To proceed to the spot*
> *b) To ascertain the facts and circumstances of the cases.*
> *c) Discovery and arrest of the suspected offenders.*
> *d) Collection of evidence relating to the commission of the offence which may consists of ...*
> *i) The examination of various persons including the accused and reduction of their statement into writing if officer thinks fit.*
> *ii) The research of place and seizure of things necessary for investigation to be proceeded with or at the trial.*
> *iii) Recovery of the material objects and gathering admissible information from the accused leading to discovery of the facts to be proved."* [২]

তদন্তকারীরা মূলত এই দুই পন্থাই অবলম্বন করে থাকে তাদের তদন্ত প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তবে অপরাধের ধরণ অনুযায়ী তদন্তপ্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়। যেমন, ধর্ষণের ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক নমুনা সংগ্রহ করে তদন্তপ্রক্রিয়া এগোয়। একজন ধর্ষিতার শারীরিক নমুনা সংগ্রহের মধ্যে থাকে শরীরের নিম্নাঙ্গে আঘাতের পরিমান কতখানি, তা যাচাই করা; পিউবিক হেয়ারে সিমেনের নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক বিভাগে পাঠিয়ে তা পরীক্ষা করা। এরপর আক্রান্ত ব্যক্তির বয়ানে পাওয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তার রক্তের নমুনায় পাওয়া ডি.এন.এ (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) সংগ্রহ করে ধর্ষিতার সিমেনে পাওয়া নমুনার সঙ্গে যাচাই করা। সেক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির থেকে পাওয়া নমুনার সঙ্গে যদি ধর্ষিতার থেকে সংগ্রহ নমুনার সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে শনাক্ত করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আবার ধর্ষিতা যদি মৃত হত, তাহলে পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে ধর্ষিতার শরীরের বিভিন্ন তথ্য যাচাই করা হত। সেক্ষেত্রে ধর্ষিতার যৌনাঙ্গের ক্ষতির পরিমান, পিউবিক হেয়ারে সিমেনের কতরকমের উপস্থিতি, যৌনসঙ্গমের কারণে মৃত্যু না ধর্ষণের পরে ধর্ষিতাকে প্রমাণ লোপাটের জন্য হত্যা করা হয়েছে, কখন তাকে হত্যা করা হয়েছে, এই সকল তথ্য যাচাই করা। পাশাপাশি চলতে থাকে অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের কারণ যাচাই। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আততায়ীর কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা, আততায়ী যৌন

ঈর্ষার জন্য এই ধরনের অপকর্মে জড়িয়েছে কিনা, ধর্ষিতার পরিবারের বয়ান কিম্বা বন্ধু-পরিজনদের বয়ান থেকে আততায়ীকে চিহ্নিত করা যায় কিনা, এইসব তথ্য যাচাই করতে হয়। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধ সংঘটনের কারণগুলোকে একজায়গায় নিয়ে এসে হাইপোথিসিস (Hypothesis) তৈরি করা হয়। এরপর তদন্তসূত্রে উঠে আসা সন্দেহভাজন একাধিক ব্যক্তির বয়ান ও শারীরিক পরীক্ষার নমুনার তথ্য যাচাই করে প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। এই তদন্তপ্রক্রিয়াটি অনেকগুলো তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধীকে শনাক্ত করেছে। এই তদন্ত প্রক্রিয়াকে অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) বলা হয়ে থাকে। আর আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method) অপরাধ সংঘটনের কারণ আর অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি বিচার করে অনুমান নির্ভর একটি হাইপোথিসিস তৈরি করে। সেই হাইপোথিসিসের ভিত্তিতেই অপরাধ সংক্রান্ত নানান সূত্রগুলিকে একটি জায়গায় নিয়ে এসে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংঘটিত অপরাধের বিচার বিশ্লেষণ করে অবরোহ পদ্ধতি। সাধারণত এই আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি আসলে একটি বিজ্ঞান-নির্ভর যৌক্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি; যার দ্বারা যে কোনও বিষয়ের সমস্যাকে যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে খণ্ডন করা হয়। অপরাধের তদন্ত আর অপরাধী শনাক্তকরণে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির গ্রহনযোগ্যতা কতখানি এই বিষয়ে আমেরিকার পেশাদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার প্রধান ড্যানিয়েল জে.বেনি বলেছেন—

> *"Inductive reasoning is observing a set of characteristics based on premise of board generalizations and statistical analysis which leads to the development of a hypothesis. Deductive reasoning is observing a set of characteristics that may be reasoned from a convergence of physical and behavioral action or patterns with in an event or a series of events such as a crime of serious of crimes."* [৩]

সুতরাং অপরাধতত্ত্ব অনুযায়ী অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের কারণ বিশ্লেষণ ও সেই কারণের ভিত্তিতে তদন্তপ্রক্রিয়াকে সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী অন্যতম গোয়েন্দা চরিত্র। যদিও ব্যোমকেশ নিজেকে ডিটেকটিভ কিম্বা গোয়েন্দা তকমায় ভূষিত করেন নি, নিজেকে সত্যান্বেষী তকমা দিয়ে সমাজের অলিতে গলিতে ঘটতে থাকা অপরাধ সংঘটনের জটিল রহস্যগুলির সমাধান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা চরিত্রগুলো বেশির ভাগই এডভেঞ্চারপ্রিয় ও অ্যাকশনধর্মী। ফেলুদা,কিরীটিরা অ্যাকশনের পাশাপাশি মগজাস্ত্রকেও ব্যবহার করেছেন তাঁদের অপরাধী শনাক্তকরণে। তবে ব্যোমকেশ বক্সী কেবল শাণিত বুদ্ধির জোরেই একের পর এক জটিল রহস্যের সমাধান করেছেন। রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ব্যোমকেশের অপরাধী শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার প্রশংসা করে বলেছেন—

> *"বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি যেন রঞ্জন রশ্মির মত মানুষের অন্তরভেদ করে।... অভিনিবিষ্ট হয়ে মক্কেলের সমস্যা শোনে। প্রয়োজন হলে অকুস্থলে যায়, নয়তো কথার ফাঁকে দু-চারটে প্রশ্ন করে শুধু মক্কেলকে। তারপর কমলালেবুর খোসা ছাড়ানোর মত একটার পর একটা সমস্যার জট ছাড়ায়। শেষে প্রকৃত আসামীর দিকে যখন ব্যোমকেশ আঙুল বাড়িয়ে দেয়, বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে যেতে হয়। বন্দুক-পিস্তল নেই, ছোরা-ছুরি নেই, রোমহর্ষক সংঘর্ষও নেই। অথচ, কেমন নিঃশব্দেই না ব্যোমকেশ উইনিং পোস্ট পার হয়ে গেছেন।"* [৪]

কেবলমাত্র বুদ্ধি আর অসাধারন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণগত দৃষ্টভঙ্গির কারণেই ব্যোমকেশ তাঁর সত্যান্বেষণে বাংলা সাহিত্যের বাকি গোয়েন্দাদের থেকে অনন্য। শরদিন্দুবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে লেখা কাহিনিগুলোর সম্পর্কে নিজেই বলেছেন,

> *"...গোয়েন্দা কাহিনীকে আমি ইনটেলেকচুয়াল লেভেলেই রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনী নয়। প্রতিটি কাহিনীকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসেবেও পড়তে পারেন। ...মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয় — ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে। কখনও কখনও সামাজিক সমস্যাও দেখাবার চেষ্টা করেছি। ...জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।"* [৫]

"শরদিন্দু অমনিবাস"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড জুড়ে থাকা ৩১টি গল্প সমাজ বিভক্ত নয়। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যাগুলিকে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সমাধান করে গেছেন। এই সমস্যাগুলিই হল মানুষের করা সমাজস্বীকৃত আইনের দৃষ্টিকোণে বেআইনি কাজ। সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের অপরাধ সংঘটনের কারণ ব্যোমকেশ যেমন অনুসন্ধান করেছেন, তেমনি প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে রহস্যে ঘেরা অপরাধ সংঘটনের মূল আসামীকে শনাক্ত করেছেন। একজন সাধারণ সত্যান্বেষী হয়ে অপরাধীকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদন্তপ্রক্রিয়ার সবকটি দিককে অনুসরণ করে কেবলমাত্র চৌকষ বুদ্ধির প্রয়োগেই অপরাধীদের শনাক্ত করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শরদিন্দু অমনিবাস"-এর প্রথম খণ্ডে থাকা 'দুর্গরহস্য' গল্পের মূল অপরাধীকেও শনাক্ত করতে ব্যোমকেশ সেই পন্থাকেই অনুসরণ করেছেন।

দুর্গরহস্য : প্রকাশ সাল - ২০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

দুর্গরহস্যের রহস্যময়তা :

দুর্গরহস্যের দুটি খণ্ড। এক পূর্বখণ্ড অপরটি হল উত্তরখণ্ড। গল্পের স্থান সাঁওতাল পরগণার রামকিশোরের বাড়ি। রামকিশোরের পূর্বপুরুষ ছিলেন বাংলার নবাব আলিবর্দীর বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র, নাম জানকীরাম। নবাবের সুনজরে থাকায় জানকীরাম রাজা খেতাব পেয়ে সুবা বিহার শাসনের দায়িত্ব পান এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। সেই ধন সম্পদ মারাঠা বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করতে জানকীরাম সাঁওতাল পরগণায় স্থিত এক দুর্গম গিরিসংকটের মধ্যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মান করেন। এইভাবে জানকীরাম তাঁর বুদ্ধির বলে পরিবার আর ধনসম্পত্তি রক্ষা করলেন। সব ঠিকঠাকই ছিল। ভারতবর্ষের শাসনভার সময়ের সাথে সাথে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এল। পলাশীর যুদ্ধের একশো বছর পেরিয়ে গেছে ততদিনে। জানকীরামের সাধের দুর্গে তখন তাঁর চতুর্থ আর পঞ্চম পুরুষ রাজারাম ও তাঁর ছেলে জয়রাম বাস করতেন। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ আর পারিপার্শ্বিক জমিদারীর আয় থেকে স্বচ্ছন্দে তাঁদের দিন চলে যেত। জানকীরামের বংশধরেরা টাকা আসলেই তা সোনায় পরিণত করত। এইভাবেই তাদের অর্থভাণ্ডারে রাশি রাশি মোহর আসরফি জমা হতে থাকল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ায় রাজারাম ও জয়রাম প্রমাদ গুণলেন। বিদ্রোহী সিপাহীদের লুঠতরাজ শুরু হওয়ায় রাজারাম ধনসম্পদকে রক্ষা করতে দুর্গের একটি কামানে লুকিয়ে রাখলেন। তার আগে পরিবারের সদস্যদের কিছু অর্থ দিয়ে রাজারাম আর জয়রাম তাদের দুর্গের নিকটবর্তী একটি সাঁওতাল পল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন। যেহেতু পরিবারবর্গের অনুপস্থিতিতে ধনসম্পদকে রক্ষিত করে রেখেছিলেন তাই রাজারাম আর জয়রাম ভিন্ন কেউ জানত না দুর্গের কোথায় ধন রক্ষিত আছে। সিপাহীদের আক্রমণে রাজারাম আর জয়রাম মারা গেলে দুর্গ নিথর হয়ে পড়ে থাকল। প্রায় ষাট বছর জানকীরামের বংশের ইতিহাস অন্ধকারে ডুবে গেল। বিশ শতকের দুই-এর দশকে জানকীরামের দুই উত্তরসুরী রামবিনোদ ও রামকিশোর ঘি আর লোহার ব্যবসা করে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হল। নিজেদের অর্থ দিয়ে পুনরায় তাঁদের পৈতৃক গৃহে ফিরে এল। তবে এরই মাঝে রামবিনোদের রহস্যময় মৃত্যু হয়। রামকিশোর পুরান দুর্গের পাশেই নতুন বাড়ি বানিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করল। দুর্গ সংস্কার হল। কিন্তু সেটা অব্যবহৃতই পড়ে থাকল। এই হল দুর্গের ইতিহাস। সুতরাং রামকিশোরের পুনরায় দুর্গে ফিরে আসার পেছনে রহস্য যে রাজারাম ও জয়রামের রক্ষিত বিপুল সম্পত্তির পুনরুদ্ধার, তা আর কারোর বুঝতে সমস্যা নেই। কিন্তু সেটা কোথায় লুকানো আছে,সেটাই কেবল অজানা।

গল্পে উল্লিখিত অপরাধ ও অপরাধ সংঘটনের কারণ :

রামকিশোরবাবুর জামাই মণিলাল দুর্গে রক্ষিত বিপুল সম্পত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল।সেই সম্পত্তির একাই ভাগীদার হবার জন্য নিজের স্ত্রী হরিপ্রিয়াকে এক অদ্ভুত কৌশলে হত্যা করে।মৃত্যুটা যাতে স্বাভাবিক মনে হয়,তার জন্যই সে তার দুটো ফাউন্টেন পেনের কালির রিজার্ভারে সাপের বিষ ভরিয়ে রাখতো।সেই পেনদুটির সহযোগে জঙ্গলে পারিবারিক বনভোজনের সুযোগে হরিপ্রিয়াকে হত্যা করল।সবাই ভাবল হরিপ্রিয়ার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে।মণিলাল

দরিদ্র ঘরের ছেলে হবার জন্য শ্বশুরমশাইয়ের কাছে স্নেহের পাত্র হয়ে থাকলো এবং ছোটমেয়ে তুলসীর সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও পেল।এরপর যখন ঈশানবাবু দুর্গে এলেন,তাঁর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করল মণিলাল দুর্গের কোথায় ধনসম্পদের অস্তিত্ব আছে।যখন সে ঈশানবাবুর মাধ্যমে দুর্গের মধ্যে একটি গুপ্তঘরের সন্ধান পেল,সেই মুহূর্তে ঈশানবাবুকেও একই পদ্ধতিতে তাঁর শরীরে বিষ ঢুকিয়ে হত্যা করল।এমন কি রামকিশোরের যৌবনকালে মারা যাওয়া দাদা রামবিনোদবাবু সন্ন্যাসীর বেশে দুর্গের নিকটে একটি গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল,তাকেও দুটো ফাউন্টেন পেনের নিবের সাহায্যে বিষ ঢেলে হত্যা করে মণিলাল।আসলে রামকিশোরবাবুর পূর্বপুরুষের রক্ষিত বিপুল সম্পত্তি একাই ভোগ করার আকাঙ্ক্ষায় রামকিশোরের বংশলোপ করার পরিকল্পনা করেছিল মণিলাল।সেই সূত্র ধরেই মণিলাল একের পর এক খুনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিল।

অপরাধী শণাক্তকরণের প্রক্রিয়া আলোচনা :

অপরাধী শনাক্তকরণের পূর্বে রামকিশোর বাবুর পরিবারের সদস্যদের পরিচয় জানাটা আবশ্যক। রামকিশোরের পরিবারের সদস্যরা সাঁওতাল পরগণার ডি এস পি পুরন্দর পাণ্ডের মতে,

> *"বংশের একটা মানুষও সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। রামকিশোরবাবুকে আপাতদৃষ্টিতে ভালমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু সেটা পোষ-মানা বাঘের নিরীহতা। বড় ছেলে বংশীধর একটি আস্ত কাঠগোঁয়ার; সে যেভাবে জমিদারী শাসন করে, তাতে মনে হয় সে চেঙ্গিস খাঁর ভায়রাভাই। ...বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই বৌয়ের অপঘাতে মৃত্যু হয়। ...মেজ ছেলে মুরলীধর আর একটি গুণধর। ট্যারা এবং কুঁজো; বাপ বিয়ে দেননি। বাপকে লুকিয়ে লোচ্চামি করে। ...দুই ছেলেই বাপকে যমের মত ভয় করে। ...মুরলীধরের পরে এক মেয়ে ছিল, হরিপ্রিয়া। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। ...তবে জামাইটি সহজ মানুষ। ...গদাধরটা ন্যালা-ক্যাবলা; তার যেটুকু বুদ্ধি সেটুকু দুষ্টু-বুদ্ধি। ...তুলসী মেয়েটা যে কী তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। নির্বোধ নয়, ন্যাকাবোকা নয়, ইঁচড়ে পাকাও নয়; তবু যেন কেমন একরকম।"* [৬]

এই পরিবারের চরিত্রগুলির সম্পর্কে ব্যোমকেশকে ধারণা দিয়েছেন ডিএসপি সাহেব পুরন্দর পাণ্ডে। তাঁরই প্রয়োজনে ব্যোমকেশের সাঁওতাল পরগণায় আসা। আসার কারণ, বহরমপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র মজুমদারের রহস্যময় মৃত্যুর সত্য উদ্ঘাটন। ঈশানবাবু সাঁওতাল পরগণায় এসেছিলেন বন্ধু রামকিশোরের বাড়িতে হাওয়াবদল করতে। অতিথি হয়েই নির্জন দুর্গেই থাকছিলেন তিনি। হঠাৎ একদিন রাতে সর্পাঘাতে মারা যান। কিন্তু অটোপ্সির রিপোর্টে ডাক্তার ও পুলিশের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ঈশানবাবুর রহস্যময় মৃত্যুর পেছনে কারণটা কী? তিনি কি সত্যিই জানতে পেরেছিলেন দুর্গের মধ্যে কোথায় লুকানো আছে রাজারাম ও জয়রামের গচ্ছিত সম্পদ? অর্থাৎ সম্পদের অস্তিত্ব জানতে পারাটাই কি তাঁর কাল হল? পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে কিন্তু তাই উঠে এসেছে। কারণ ঈশানবাবুর নিথর হাতের মুঠিতে ছিল একটা স্বর্ণমুদ্রা। আর শীতের সময় সাপের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ দেখা গেছে। অটোপ্সিতে পাওয়া গেছে গোখরো সাপের বিষের অস্তিত্ব। পুলিশ দুর্গ পরীক্ষা করেও বিষাক্ত সাপের অস্তিত্ব পায় নি। তাছাড়া দুর্গ পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। সেখানে সাপের গা বেয়ে ওঠাও অসম্ভব। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই পারে, কিন্তু দুর্গে ইঁদুর, ব্যাঙ কিছুরই অস্তিত্ব নেই, সেক্ষেত্রে সাপের দুর্গে কষ্ট করে উঠে আসাটাও বেমানান।সব মিলিয়েই দুর্গকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি রহস্য দেখা যাচ্ছে, যথা—

ক) দুর্গের মধ্যে রাজারাম ও জয়রামের রক্ষিত ধনসম্পদের অস্তিত্ব ঈশানবাবু জেনেছিলেন। কারণ মারা যাবার সময় তাঁর হাতের মুঠিতে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

খ) দুর্গের মধ্যে সাপ প্রবেশ করার মত কোনও কারণ নেই। তাও আবার শীতে পাহাড়ের গা বেয়ে সাপের দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা এককথায় অসম্ভব।

গ) যদি সাপ দুর্গে প্রবেশও করে তাহলে সেই সাপকে বাইরে থেকে কেউ দুর্গের মধ্যে এনেছে। কে এনেছে? আনার কারণটাই বা কী? ঈশানবাবুর সঙ্গে শত্রুতা এই বাড়ির কারোর আছে কিনা, সেই বিষয়টিও উঠে আসছে।

ঘ) রামকিশোরের পূর্বজদের গচ্ছিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করে সেই সম্পদের ভাগবাটোয়ারায় অসন্তুষ্টির কারণেও ঈশানবাবুকে হত্যা করাও হতে পারে।

ঈশানবাবুর রহস্যময় মৃত্যুর পেছনে এই সকল তথ্যগুলোকে অপরাধকর্মের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় আরোহ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে হত্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলির দ্বারা একটি তদন্ত প্রকল্প অর্থাৎ হাইপোথিসিস (hypothesis) তৈরি করা হয়। এটি তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়। যা ডিএসপি পুরন্দর পাণ্ডের তত্ত্বাবধানে সাঁওতাল পরগণার পুলিশ তদন্ত করে তৈরি করেছে। এই হাইপোথিসিসের ভিত্তিতে পুরন্দর পাণ্ডের অনুমান রামকিশোরের পরিবারেরই কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঈশানবাবুকে সাপে কামড়ানোর ইস্যু দেখিয়ে হত্যা করেছে।

ব্যোমকেশ বক্সী সেই হাইপোথিসিসের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করলেন। দুর্গের মধ্যেই রামকিশোরের আতিথ্য নিয়ে তদন্ত শুরু করলেন। ঈশানবাবুর মারা যাবার পর তার টিনের তোরঙ্গ থেকে পাওয়া একটি ডায়রি পেয়েছিল পুলিশ। ব্যোমকেশ সেই ডায়রি থেকে কিছু তথ্য বের করলেন। সেইগুলি হল,

ক) "রামবিনোদ বাঁচিয়া নাই। আমার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গিয়াছে। সে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু"! [৭]

খ) বংশীধর রামবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র, কলেজে পড়তে এসে বংশীধর এক মারাত্মক মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। ঈশানচন্দ্র তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন।

গ) ঈশানবাবু ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন, কোম্পানির সিপাইরা রাজারামের ধন সম্পত্তি বের করে নিয়ে যেতে পারেনি।

ঘ) ঈশানচন্দ্রকে দুর্গ থেকে তাড়ানোর জন্য ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু তিনি দুর্গ ত্যাগ করবেন না জানিয়েছেন ডায়েরিতে।

ঙ) ঈশানচন্দ্র দুর্গের মধ্যে ফারসি ভাষায় লেখা একটি তথ্য পান, যার বাংলা তরজমা করলে এই দাঁড়ায় যে, "যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি, তাহলে আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।" [৮]

এই তথ্যগুলিকে পর্যালোচনা করে ব্যোমকেশ অনুমান করেন যে ঐতিহাসিক ঈশানচন্দ্র মজুমদার রাজারামের গচ্ছিত সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন। যার কারণেই তাঁর নিথর হাতে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। ডায়রি থেকে আরও পাওয়া তথ্য যেমন, দুর্গের মধ্যে কে ঈশানবাবুকে ভয় দেখাচ্ছে, বংশীধর কলেজজীবনে কী এমন কেলেঙ্কারি করেছে যে ঈশানবাবু তাকে বাঁচিয়েছেন, আর রামবিনোদবাবুর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর রহস্যটা কী!

ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুর বিশ্বস্ত নায়েব চাঁদমোহনবাবুর থেকে রামবিনোদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ইতিহাস জেনে নেন। রামবিনোদবাবু প্লেগে আক্রান্ত হলে তাকে নদীর চড়ায় ফেলে পালিয়ে যান রামকিশোর, চাঁদমোহন আর ঈশানচন্দ্র। আর বংশীধর কলেজে পড়াকালীন তার এক সহপাঠীকে ধুতুরার বীজ খাইয়ে প্রায় মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ঈশানবাবুর সহযোগিতায় সে যাত্রায় রক্ষা পায়।দুর্গে তদন্ত চলাকালীন ব্যোমকেশ ও অজিত উভয়েই সাপের আক্রমণ থেকে বাঁচে। সেক্ষেত্রে মুরলীধরের সাকরেদ গণপৎ মুরলীধরের আদেশে কাজটি করে। এক্ষেত্রে ব্যোমকেশের অনুমান মুরলীধর দুর্গের মধ্যে তার অপকর্মগুলো করে। ব্যোমকেশরা দুর্গের মধ্যে থাকার জন্য তার কুকাজ করাটা সম্ভব হচ্ছিল না, তাই সে সাপের ভয় দেখিয়ে দুর্গ থেকে ব্যোমকেশ ও অজিতকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্রকে হত্যার পেছনে আপাতদৃষ্টিতে বংশীধর আর মুরলীধরের মোটিভ থাকাটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হয় ব্যোমকেশের। কারণ,

ক) বংশীধরের কলেজজীবনের কেলেঙ্কারির অন্যতম সাক্ষি ছিলেন ঈশানচন্দ্র মজুমদার। সেক্ষেত্রে বংশীধরকে ব্ল্যাকমেল করবার সুযোগও থাকতে পারে। তাই রাগের বশে ঈশানচন্দ্রকে হত্যা।

খ) মুরলীধর তার অপকর্ম করবার সুযোগ পাচ্ছিল না, তাই দুর্গকে ঈশানবাবুর থেকে মুক্ত করতে হত্যা কিংবা গণপতের মাধ্যমে মুরলীধর জানতে পারে ঈশানবাবু দুর্গে পূর্বপুরুষের গচ্ছিত ধনের সন্ধান পেয়েছেন। সেই সূত্রে ঈশানবাবুর সঙ্গে বিবাফ এবং তাঁকে হত্যা করে।

এই দুই সুত্র ধরে তদন্ত করতে গিয়ে ব্যোমকেশ আরেকটি বিষয় জানতে পারেন — পিতা ও পুত্রদ্বয়ের মধ্যে দুর্গের অধিকার নিয়ে লড়াই চলছে। প্রত্যেকে এতটাই দুর্গ পাবার জন্য মরিয়া যে দুর্গের উপর তাদের অধিকার কিছুতেই ছাড়তে রাজি নয়। সুতরাং দুর্গের মধ্যে ধনসম্পত্তির অস্তিত্ব রয়েছে জেনেই এরা কেউই দুর্গ ছাড়তে রাজি হচ্ছে না।

ব্যোমকেশ দুর্গের ভেতরের অন্যান্য ঘরগুলির তল্লাশি চালিয়ে একটি গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান পান। তার ভেতরে একটি ইলেক্ট্রিক টর্চও পান। ব্যোমকেশ নিশ্চিত হন যে ঈশানবাবু দুর্গের ভেতরে গচ্ছিত ধনের অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ করার আগেই তাঁকে আততায়ী হত্যা করেছেন। এক্ষেত্রে ঈশানবাবুর কাছে দুর্গের ভেতরে থাকাকালীন কার কার বেশি যাতায়াত ছিল এবং ঈশানবাবুকে কে ইলেকট্রিক টর্চ দিয়েছিল, এই বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজন পড়ে। ব্যোমকেশ তুলসীর মাধ্যমে প্রথমে কিছু জানার চেষ্টা করলে তুলসী কতগুলো তথ্য সামনে তুলে ধরে। সেগুলি হল—

ক) তুলসী যেহেতু সারাদিন খামখেয়ালি হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাই যেদিন যেদিন বাড়িতে কোনও ব্যক্তির রহস্যজনকভাবে মারা গেছে, সেদিন তাকে কেউ না কেউ ঘরে বন্দি করে রেখেছে। যেমন বংশীধরের বউ মারা যাবার সময় তুলসীকে ঘরে বন্দি করে রেখেছিল দিদি হরিপ্রিয়া। যেদিন ব্যোমকেশদের উপর আক্রমণ হয়, সেদিন তুলসীকে বন্দি করে রেখেছিল তার মেজদা অর্থাৎ মুরলীধর। আর ঈশানবাবু যেদিন মারা যান, সেই রাতে তুলসীকে ঘরবন্দি করে রেখেছিল পিতা রামকিশোর।

খ) তুলসী তার মাস্টারমশাই রমাপতিকে ভালবাসে। তুলসী এও জানায় সে মণিলালকে পছন্দ করে না। মণিলাল মাস্টারমশাইকে হিংসা করে। রমাপতির নামে মণিলাল রামকিশোরের কাছে নিন্দেও করে।

প্রসঙ্গ সূত্রে ব্যোমকেশও তার প্রমাণ পায়। রমাপতিকে চোর আখ্যা দিয়ে রামকিশোরের কাছে নালিশ করছিল মণিলাম। যে টর্চ চুরির কথা উঠেছিল, সেই টর্চ পাওয়া যায়, গুপ্ত তোষাখানা থেকে। সেই সূত্রে রমাপতিও সন্দেহের বাইরে নয়। কারণ ঈশানচন্দ্রের কাছে বেশ যাতায়াত ছিল রমাপতির। তবে মণিলালেরও যে যাতায়াত ছিল, সেটা মণিলালের সঙ্গে কথোপকথন সূত্রেই জানতে পারেন ব্যোমকেশ। তদন্তের খাতিরে রমাপতির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ব্যোমকেশ রমাপতির থেকে কিছু তথ্য পান। সেগুলি হল,

১) অবস্থায় পড়লে রামকিশোরের পরিবারের সকলেই খুন করার সামর্থ্য ধরে।

২) মণিলাল নিজে হাতে খুন না করতে পারলেও চুকলি করে মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে।

৩) রমাপতি টর্চ চুরি করেনি।

ব্যোমকেশ এই তথ্য থেকেই অনুমান করলেন যে মণিলাল টর্চের জোগান দিয়েছিল ঈশানচন্দ্রকে। কিন্তু ঈশানবাবুর মৃত্যুর পর টর্চের সন্ধান না পাওয়ায় মণিলাল টর্চ চুরির দোষ চাপায় রমাপতির ঘাড়ে। সুতরাং মণিলালের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল ঈশানবাবুর। আর ঈশানবাবু যে দুর্গের মধ্যে গচ্ছিত ধন সম্পদের সন্ধান করছেন, সেই বিষয়েও ওয়াকিবহাল ছিল। মণিলালও সন্দেহের বাইরে নয়। আবার, কর্তা রামকিশোরও সন্দেহের বাইরে যান না। কারণ তুলসীর কথায়, বাড়িতে যতবারই অপঘাতে মৃত্যু কিংবা অনৈতিক কাজ হয়েছে, সেই দিনগুলিতে তুলসীকে বাড়ির কেউ

না কেউ ঘরবন্দি রেখেছে। ঈশানবাবুর রহস্যময় মৃত্যুর দিন রামকিশোর তুলসীকে ঘরবন্দি করে রাখে। এক্ষেত্রে, ঈশানচন্দ্র মজুমদারের হত্যার মোটিভের সূত্র ধরে যাদের সন্দেহের তালিকায় নিয়ে আসেন ব্যোমকেশ, তারা হলেন,

১) বংশীধর
২) মুরলীধর
৩) চাঁদমোহন
৪) রামকিশোর
৫) মণিলাল।

এরা প্রত্যেকেই ব্যোমকেশের সন্দেহভাজন তালিকায়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে কেউই সন্দেহের বাইরে যাবে না। কিন্তু হত্যাপ্রক্রিয়াটাই ব্যোমকেশকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কারণ, সাপের অস্তিত্ব। একে পাহাড়ী অঞ্চল, তার উপর ঠান্ডা। সাপ কীভাবে এই শীতে কামড়াতে পারে, যেখানে মানুষই কাতর। এই বিষয়েই রহস্য থেকে যায়।

ব্যোমকেশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের একটি প্রাথমিক তালিকা করে অনুসন্ধান চালান। দুর্গের সামনে গাছতলায় বসা সন্ন্যাসীর থেকে কিছু তথ্য পাবার আশায় সন্ন্যাসীর কাছে গেলে সন্ন্যাসী জানায় যে মধ্যরাতে আসলে সে কিছু জানাবে। সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ ব্যোমকেশ দুবার পান। একবার রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করার পূর্বে, দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাতে কে বা কারা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সেই বিষয়ে জানতে গিয়ে। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতেই ব্যোমকেশ বুঝতে পারেন সন্ন্যাসী আসলে রামবিনোদ। কারণ রামকিশোরের সঙ্গে তার মুখের মিল খুঁজে পান। বুঝতে আর বাকি থাকে না ব্যোমকেশের যে রামকিশোরের বাড়ির সামনের গাছতলায় সন্ন্যাসীটিকে কেন তাড়িয়ে দেবার সাহস পান নি? কেনই বা রামকিশোরের বাড়ি থেকে সন্ন্যাসীর জন্য সিধে আসে? তবে বাড়ির বাকি সদস্যদের কাছে বিষয়টি অজ্ঞাত। জানতে পারলে রামকিশোর ছাড়া আরেকজন জানবে, সে হল বাড়ির নায়েব মশাই চাঁদমোহন। কিন্তু মধ্যরাতে সন্ন্যাসীর কাছে এলে ব্যোমকেশ দেখে সন্ন্যাসী মৃত। সন্ন্যাসীও সর্পাঘাতে মৃত। ব্যোমকেশ সন্নাসীর মৃত্যুর কারণ অনুমান করে বুঝতে পারেন, পরিবারের কেউ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর জন্য দায়ি। কারণ সন্ন্যাসী ব্যোমকেশকে মধ্যরাতে আসতে বলেছে। আততায়ী সেটা জানতে পেরে প্রমাদ গুণেছে এবং প্রমাণ লোপাট করতে সন্ন্যাসীকেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে হত্যা করেছে। একে প্রচন্ড শীত, তার উপর দুর্গের এলাকায় সাপের আনাগোনা। অথচ, ব্যোমকেশ, অজিত, সীতারাম কেউই সাপের অস্তিত্ব খুঁজে পান নি। অথচ, ঈশানবাবুর পায়ের যে জায়গায় সর্পাঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, সেই একই জায়গায় সাপ সন্ন্যাসীকে কামড়েছে। এর থেকে ব্যোমকেশের মনে ইনটুইশন কাজ করে,

১) আততায়ীর কাছে বিষ আছে। যেটা সে কোনও কিছুর মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখে।
২) কারো শরীরে বিষ প্রয়োগ করতে গেলে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের প্রয়োজন, কিংবা সেই জাতীয় সূক্ষ্ম যন্ত্র।
৩) ঈশানবাবুর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রাথমিক তদন্তে সেটা অনুমান করা হয়েছিল যে আকস্মিক সর্প দংশনে আক্রান্ত হয়ে তিনি হয়তো চৌকাঠে ধাক্কা খেয়েছেন বলেই তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর হত্যাপ্রক্রিয়া দেখে ব্যোমকেশ নিশ্চিত হলেন যে ঈশানবাবুকে আগে আঘাত করা হয়, তারপর তার শরীরে বিষপ্রয়োগ করা হয়। যদিও সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে তা হয় নি। সন্ন্যাসী সারাদিন গঞ্জিকা, ভাঙ সেবন করে এমনিতেই ঘোরে থাকেন। তাই তার শরীরে বিষপ্রয়োগ করতে আততায়ীর অসুবিধা হয় নি।

এই তিনটি সূত্রকে সামনে রেখে ব্যোমকেশ অপরাধীকে শনাক্ত করতে উদ্যোগী হলেন। প্রথমে তিনি সীতারামের মাধ্যমে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলেন পরিবারের কাদের সঙ্গে বেদে জাতিদের যোগাযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন বিষপ্রয়োগের অস্ত্র কী হতে পারে? তার জন্য এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকের নিত্যদিনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে ভাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা বিষয় তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুললো, সেটা হল

মণিলালের কাছে দুটো ফাউন্টেন পেন থাকা সত্ত্বেও কেন একটি পেন তুলসী নেওয়ায় রেগে গিয়েছিল? এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাইপারডোমিক সিরিঞ্জের বিকল্প অস্ত্র হিসেবে ফাউন্টেন পেনকে ব্যবহার করা যায়, এই সম্পর্কে ব্যোমকেশ সুনিশ্চিত হলেন। এরপর সীতারামের থেকে যখন জানতে পারলেন বেদেদের সঙ্গে রামকিশোরের পরিবারের মধ্যে মণিলালের সঙ্গেই ভাল যোগাযোগ ছিল, তখন আততায়ীর সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেন ব্যোমকেশ। পুরন্দর পাণ্ডের মাধ্যমে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে রামকিশোরের বাড়ি পুলিশ ব্যোমকেশের নেতৃত্বে বিষের অস্তিত্ব পেতে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। ব্যোমকেশ মণিলালের কাছে ফাউন্টেন পেন দুটি দেখতে চাইলে মণিলাল,

> *"দেরাজ হইতে পার্কারের কলমটি বাহির করিয়া দ্রুতহস্তে তাহার দুদিকের ঢাকনি খুলিয়া ফেলিল; কলমটাকে ছোরার মত মুঠিতে ধরিয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। সে-চক্ষে যে কী ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না।"* [৯]

আসলে মণিলালের হিংস্র মনোভাবের কারণ হল সে চেয়েছিল রামকিশোরবাবুর পরিবারকে তিলে তিলে ধ্বংস করে একাই রাজারাম-জয়রামের গচ্ছিত ধন ভোগ করতে। হয়তো মণিলাল তার স্ত্রী হরিপ্রিয়ার থেকেই রামকিশোরের পূর্বজদের দুর্গের মধ্যে গচ্ছিত ধন রাখার খবর জেনেছিল। তারপর থেকেই সে প্রথমে হরিপ্রিয়াকে সাপের বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে। এরপর ঈশানবাবুর থেকে জানতে পারে যে ধনসম্পদের অস্তিত্ব সন্ধান করছেন তিনি। তখন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল মণিলাল। কিন্তু ঈশানবাবু যখন তাকে গুপ্ত তোষাখানার কথা জানান, সেদিনই সেই তোষাখানার সন্ধান পেয়েই ঈশানবাবুকে টর্চ দিয়ে আঘাত করে এবং ফাউন্টেন পেনের নিবকে সিরিঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর শরীরে সাপের বিষ প্রবেশ করিয়ে হত্যা করেন। এরপর সন্ন্যাসীকে মণিলাল হত্যা করে প্রমাণ লোপাটের তাগিদে। আসলে নিপাট ভদ্রলোকের আড়ালে এক শয়তান ছিল মণিলাল। গরীব ঘরের সন্তান হবার জন্যই সে তেমনভাবে সুখ সাচ্ছন্দ্য লাভ করার সুযোগ পায় নি। তার উপর ঘরজামাই হয়ে জীবন কাটাতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের থেকেও নানা সময়ে লাঞ্ছিতও হতে হয়েছে। তার উপর শ্বশুরবাড়ির পূর্বজদের গচ্ছিত ধনের বিষয়টি জানতে পারায় তার অবদমিত মনে লুকিয়ে থাকা উদগ্র লোভ জেগে ওঠে। দীর্ঘ জীবনের লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য তাকে ভবিষ্যতে প্রচুর সম্পত্তি লাভ আর সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত করে। যার কারণেই সিংহ পরিবারের বিপুল সম্পত্তি ভোগের বাসনায় অপরাধ সংঘটনে বাধ্য করে। অপরাধতত্ত্বের বিচারে মণিলাল আবেগপ্রবণ অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হলেও, তার উদগ্র লোভ ও হিংস্র প্রতিক্রিয়া তাঁকে স্বভাব অপরাধীতে পরিণত করেছে। তাই সে অপরাধ সংঘটনে নিজের স্বার্থকেই সবার আগে গুরুত্ব দিয়েছে। অবশেষে মণিলাল নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে অসমর্থ হল, ব্যোমকেশের বুদ্ধির কাছে হার মানল, তখন সেই ফাউন্টেনের বিষ ভরা নিব নিজের শরীরে ফুটিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিল।

ব্যোমকেশ রামকিশোরের পরিবারকে শুধু এই হিংস্র স্বভাবের মণিলালের হাত থেকে রক্ষাই করেন নি, তিনি ঈশানচন্দ্র মজুমদারের অসমাপ্ত কাজকেও সম্পূর্ণ করেছিলেন। ঈশানচন্দ্র ফারসি ভাষায় লেখা একটা তথ্য পান, সেখানে লেখা ছিল মোহনলালের জিম্মায় ধনসম্পদ রাখা আছে। ব্যোমকেশ তাঁর বুদ্ধিমত্তা আর অনুমানদক্ষতার প্রয়োগে দুর্গের মধ্যে পড়ে থাকা অকেজো কামানকেই মোহনলাল হিসেবে চিহ্নিত করেন। ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায়, এমন অনেক নাম তখনকার কামানগুলির থাকত। দুর্গে পড়ে থাকা অকেজো কামানের অস্তিত্ব কেন? এই বিষয়ে তখনই ব্যোমকেশ নিশ্চিত হয়েছিলেন, যখন দুর্গের ভিতরে সব ঘর, গুপ্ত তোষাখানা সন্ধানের পর ধন সম্পদের অস্তিত্ব মেলেনি। তখন এই কামান ছাড়া ধনসম্পদকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া অন্য উপায় নেই বলেই অনুমান করেন ব্যোমকেশ। পরবর্তীতে সেই কামানের লোহা কাটা হলে সেখানে রাজারাম-জয়রামের গচ্ছিত ধনের সন্ধান পাওয়া যায়। দুর্গরহস্যের জটিল রহস্য সমাধানে ব্যোমকেশ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় দেন।

অপরাধতত্ত্বের আলোকে শরদিন্দু ও ব্যোমকেশের গুরুত্ববিচার :

ব্যোমকেশ প্রাথমিক তদন্তসূত্রকে সামনে রেখে সেই তথ্যের ভিত্তিতে সংঘটিত অপরাধের কার্যকারণসূত্রগুলিকে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রয়োগ করেন এবং অনুসন্ধান চালান। প্রাথমিক তদন্তের পরেও তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি সংঘটিত অপরাধের

ভিত্তিতে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে, যার ভিত্তিতে তিনি অপরাধী হিসেবে মণিলালকে চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতিকে সামনে রেখে অবরোহ পদ্ধতির দ্বারা অপরাধীর অপরাধসংঘটন সম্পর্কিত অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেই তথ্যগুলির ভিত্তিতে অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব হাইপোথিসিসের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে অপরাধীকে শনাক্ত করে ফেলেন। একবিংশ শতকের গোয়েন্দারা আধুনিক প্রক্রিয়ায় তদন্তকার্য চালিয়ে থাকলেও ব্যোমকেশ সেই সকল আধুনিক প্রয়োগ তদন্তকার্যে প্রয়োগ করতে পারেন নি বা ব্যোমকেশের যুগে এই প্রক্রিয়া ততটা আধুনিক হয় নি, তাই হয়তো গল্পের ছলেই ব্যোমকেশের মাহাত্ম্যকে আমরা গল্প সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু বাস্তবের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি বিচার করি, তাহলে দেখব অসাধারন বুদ্ধিমত্তা ও বিচারবিশ্লেষণের যথার্থ প্রয়োগে ব্যোমকেশ বক্সী একালের আধুনিক গোয়েন্দাদের থেকেও অনেক এগিয়ে থাকবেন। একবিংশ শতকের আধুনিক তদন্ত বিভাগ যতই আধুনিকতার ছাঁচে গড়ে উঠুক না কেন, যে কোনও অপরাধের কিনারা করতে আরোহ পদ্ধতি এবং অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগের মধ্যে তাঁদের যেতেই হবে। সেক্ষেত্রে শার্লক হোমস কিংবা ব্যোমকেশ কেউই ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বন করেন নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর ব্যোমকেশকে, গোয়েন্দাদের মতোই সমাজের অলিগলিতে ঘটে চলা রহস্যময় অপরাধের কিনারা করতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবনার পথে চালিত করেছেন, তা ব্যোমকেশের অপরাধী শনাক্ত করার পদ্ধতি থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। সেদিক থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অপরাধতাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে। কারণ, তাঁর ভাবনারই ফসল হলেন ব্যোমকেশ বক্সী।

তথ্যসূত্র :

১. Caldwell, Robert G., Criminology, Roland Press Company, New York, USA, January 1956, Page 263.
২. Banerjee Amitava, Investigation of Crimes, Purna Publication House, Kalyani, West Bengal, October
2001, page 14
৩. https://archive/org. The Use of Inductive and Deductive Reasoning in Investigation and Criminal Profiling by Daniel J. Benny, Page 12-14
৪. চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পাদিত, গোয়েন্দা ও গোয়েন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা -৭৫১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৫৪
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড ব্যোমকেশ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৪
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৫
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৫৬

আকর গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস প্রথম খণ্ড, ব্যোমকেশ; ১৯৭০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস দ্বিতীয় খণ্ড, ব্যোমকেশ; ১৯৭২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ :

১. পঞ্চানন ঘোষাল, অপরাধ-বিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, ২০১৮, লালমাটি, কলকাতা
২. রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পাদিত, গোয়েন্দা ও গোয়েন্দা, ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৩. হামজা হোসেন, অপরাধ বিজ্ঞান, মুক্তধারা, ১৯৭৪, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, বাংলাদেশ

সহায়ক ইংরাজি গ্রন্থ :

1. Banerjee Amitava, Investigation of Crimes, 2001 (October), Purna Publication House, Kalyani, West Bengal
2. Caldwell Robert. G, Criminology, 1956 (January), Roland Press Company, NewYork, USA

অন্তর্জাল সূত্র :

1. https://archive.org/details/Investigation
2. http://archive.org/details/Rape Case Study (Post-Mortem Report according to Rape and Murder, 1992 (Kolkata Police)